পরিক্রমা

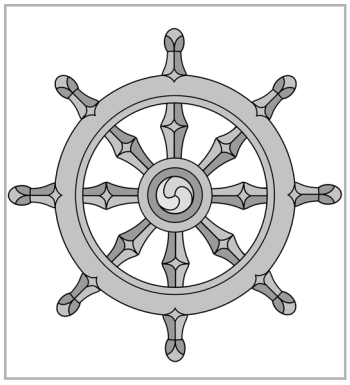

সঙ্ঘ : দুই যুগ

ইতিহাসের পাতায় রাজরাজড়া ও সাধারণ মানুষের কথা যেমন আছে, তেমনি আছে সন্ন্যাসিসঙ্ঘের কথা। বিশেষ করে ভারতের ইতিহাসে বারবার ধর্মের মধ্য দিয়েই হয়েছে ইতিহাসের গতিপথের পরিবর্তন।

বৈদিক যুগের পর এসেছিল বৌদ্ধযুগের প্লাবন। ভগবান বুদ্ধের দেশনা নিয়ে ত্যাগী সন্ন্যাসিসঙ্ঘ রূপ নিয়েছে ভারত জুড়ে। ভ্রাম্যমাণ বৌদ্ধ সাধুরা—চরথ ভিক্খকবে চারিকং বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়—এই মন্ত্র নিয়ে লোকহিতে দিকে দিকে বিচরণ করেছেন। কিন্তু প্রথম দিকের ওই কঠিন-কঠোর নিরাশ্রয় ভিক্ষান্নের জীবন বেশিদিন সম্ভব হয়নি। বর্ষার চাতুর্মাস্য যাপন করতে তাঁদের জীবন-ধারণের জন্যই আশ্রয় সন্ধান করতে হয়েছে। ফলে পটপরিবর্তন হয়েছে। সমাজের কল্যাণে যাঁরা বিচরণ করেছেন, সমাজই তাঁদের আশ্রয় গড়ে দিয়েছে। ধনীরা ভিক্ষুদের জন্য নির্মাণ করেছেন বিহার যেখানে তাঁরা স্থিত হতে পারেন। প্রথমে কাম্য না হলেও, ভিক্ষুদের অসুবিধার কথা চিন্তা করে ভগবান বুদ্ধও পরে ওইসব বিহার ও সঙ্ঘারাম নির্মাণে সম্মতি দান করেছিলেন।

প্রথমদিকে বৌদ্ধসঙ্ঘে সকলেরই প্রবেশের ও ভিক্ষু হওয়ার অধিকার ছিল। সমাজের উচ্চস্তর থেকে একেবারে নিম্নস্তরের মানুষও সেই উচ্চজীবন যাপনের অধিকার পেয়েছিল। নারীরা অবশ্য অনেক পরে ওই সঙ্ঘভুক্ত হওয়ার অনুমতি পায়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই স্বয়ং বুদ্ধদেবই কিছু মানুষের সঙ্ঘে প্রবেশ নিষেধ করেন যেমন সৈনিক, জেলপলাতক আসামি, চোর-ডাকাত, প্রতারক, খুনি, বিকলাঙ্গ ইত্যাদি। তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় সেটি হিতকরই হয়েছিল। বুদ্ধদেব চেয়েছিলেন আদর্শচরিত্র ধর্মপ্রাণ কিছু ভিক্ষু গড়তে। তাঁর হৃদয় ছিল বিশাল, মানবদরদি—তাঁর করুণায় নরহত্যাকারী 'অঙ্গুলিমাল'ও সঙ্ঘে আশ্রয় পেয়েছিলেন। কিন্তু সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বুদ্ধদেব তাঁর দীর্ঘ আশি বছরের জীবনে সঙ্ঘের নিয়মকানুনের ক্রমাগত পরিবর্তনও করেছিলেন। তার সাক্ষ্য রয়েছে ত্রিপিটকের অন্যতম বিনয়পিটকের চুল্লবগ্গে। বিরাট ভিক্ষুসঙ্ঘকে শুদ্ধপথে পরিচালনা করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। সঙ্ঘের মধ্যেই নিয়মনীতির অনিয়ম দেখে চিত্তশুদ্ধি ও নৈতিকতার ওপর তিনি গুরুত্ব দেন। ইতিহাসে এই প্রথম কোনও মহামানব উদার প্রসারিত মনোভাব নিয়ে বহুজনের কল্যাণে বিরাট ভিক্ষুসঙ্ঘ সংগঠন ও তা নিয়ন্ত্রণ করে নির্দিষ্ট নিয়মনীতির

শ্রীশ্রীঠাকুর-মা-স্বামীজীর কৃপায় ও সকলের সহযোগিতায় নিবোধত পত্রিকা ২৮ বর্ষে পদার্পণ করল। লেখক, পাঠক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ী সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

ছত্রচ্ছায়ায় সমবেত করতে অগ্রসর হলেন। সে-যুগের বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ত্যাগের ধারণা ছিল না বললেই হয়, অথচ তাঁরাই সর্বাগ্রে সমাজে ভগবান বুদ্ধের দেশনা গ্রহণ করে নিজেদের চিন্তাভাবনা ও জীবনযাত্রায় নতুন ভাব এনেছিলেন। কিন্তু সমাজের অধিকাংশ মানুষই ভোগের জীবনে অভ্যস্ত। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির কবল থেকে মুক্তির আলো নিয়ে ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব। জনগণের মধ্যে উচ্চজীবনের আদর্শ সঞ্চার করা কম কঠিন ছিল না। বুদ্ধদেবের সময়েই হিমাচল প্রদেশ, বারাণসী, মগধ, পাটলিপুত্র প্রভৃতি দূরদূরান্তের নগরগুলিতে পদব্রজে সন্ন্যাসিসঙ্ঘ নিয়ে তিনি বিচরণ করেছেন। আলোচনা করেছেন জীবনের সমস্যা, দিশা দেখিয়েছেন শুদ্ধজীবনের। পথেঘাটে বিরাট মঞ্চ নির্মিত হয়েছে রাজা ও জনগণের সহায়তায়। দেশে দেশে ভিক্ষুর দল বুদ্ধবাণী প্রচার করেছেন মানুষের কাছে। মহাভিক্ষু বুদ্ধদেবের জীবন ছিল সকলের চোখেই আদর্শস্থানীয়। তাঁকে পুষ্পস্তবক নয়, সঙ্ঘারাম অর্পণ করে ধন্য হয়েছেন ধনী ব্যক্তিগণ।

বুদ্ধদেব সঙ্ঘে প্রবিষ্ট সর্বস্তরের মানুষের চালনার জন্য অনবরতই নতুন নতুন নিয়ম রচনা করে আবার সেগুলির পরিবর্তন, পরিবর্ধন করেছিলেন। সুতরাং বিধানের সংখ্যা ক্রমশই বাড়তে বাড়তে আড়াইশো ছুঁয়েছিল। বাস্তবিক, মহাকারুণিক সেই দেবমানবের অবদান, মানবজাতির জন্য তাঁর মহাহৃদয়ের করুণাধারা যেমন সে-যুগকে ভাসিয়েছিল, তেমনি অন্যদিকে তাঁর অপূর্ব সংগঠন-শক্তির অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা আজও অধ্যাত্ম-ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

ভিক্ষুসঙ্ঘের পাশাপাশি সমাজে বহু সদ্‌গৃহস্থ তাঁর দেশনা গ্রহণ করে নিজেদের জীবনচর্যায় পরিবর্তন নিয়ে আসেন। বুদ্ধদেবের আহ্বান ও আকর্ষণ যে কী বিপ্লব এনেছিল তা একটি প্রবাদবচনে বোঝা যায়। বলা হয়েছে, তখন এমন একটি গৃহ ছিল না, যেখান থেকে কোনও ছেলে বা মেয়ে সঙ্ঘে যোগদান করেনি। সবটাই সত্য না হলেও এর মধ্যে তাঁর অমোঘ ব্যক্তিত্বের প্রভাব খানিকটা অন্তত অনুমান করা চলে। বুদ্ধদেব চলেছিলেন সমাজের সর্বস্তরের নরনারীকে নিয়ে—এটি অবতারের বিশেষ লক্ষণ। সেদিক দিয়ে যিশুখ্রিস্ট, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ কেউই ব্যতিক্রম নন। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্রের কথা তো লিপিবদ্ধ হয়েছে মহাপুরাণে ও মহাকাব্যে।

অপরপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের সময় ছিল নবজাগরণের কাল। ইংরেজি শিক্ষা তখন যুবকদের সামনে এক নতুন সোপান। সে-শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পশ্চিমি ভাবধারা, ভোগবাদের উল্লাস। এরই মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের টানে যাঁরা এলেন তাঁরা স্কুলকলেজের পড়ুয়া। নবীন ও প্রাচীনের দ্বন্দ্বে দীর্ণ। তাঁরা সাধুজীবনের পরিপূর্ণ ছবি দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগনিষ্ঠ জীবনে। তাঁদের লক্ষ্য ছিল স্থির, নিষ্কম্প। পাশ্চাত্য থেকে ফিরে যেদিন স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষিত ত্যাগী সন্তানদের নিয়ে বসলেন, সেদিনই দৈববাণীর মতো তাঁর শ্রীমুখ থেকে নির্গত হল সাধুজীবনের নিয়মাবলি যা সঙ্ঘের সদস্যদের সামনে উজ্জ্বল বর্ণময় পথনির্দেশিকা হয়ে উঠল। স্বামীজীর স্বল্পায়ত জীবনের এটি একটি মহত্তম কর্ম বলা চলে। যুগ-অনুযায়ী সংযোজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধনের নির্দেশও দিলেন তিনি। অন্যদিকে বিবেকানন্দের আর এক যুগান্তকারী ঘোষণা—নিয়মের নিগড়ে বদ্ধ হওয়ার জন্য সন্ন্যাসীর জীবন নয়, নিয়মের বাইরে যাওয়ার জন্যই নিয়মের সৃষ্টি। ভগবান বুদ্ধের দেশনাকে আত্মস্থ করে স্বামীজী ওই সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন।

রামকৃষ্ণ মঠ যখন বরানগরে তখনই আমরা দেখি ঘরছাড়া, ভিক্ষান্নে জীবনধারণকারী সাধুরা

বুদ্ধচরিত, বৌদ্ধদর্শন ইত্যাদি পাঠে নিজেদের বৈরাগ্য উদ্দীপিত করছেন। অন্যদিকে ইতিহাসের ছাত্র নরেন্দ্রনাথ বৌদ্ধযুগকে তাঁর বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে বিচার করে, তার ভালমন্দ বুঝে নিচ্ছেন। কে বলতে পারে এই পঠন-পাঠনের অন্তরালে এক বিরাট সঙ্ঘসংগঠনের পরিকল্পনা কার্যকরী ছিল কি না! অলৌকিক প্রতিভার উদ্ভিন্ন ছটার গতি নির্ণয় করা সহজ নয়। তা দুর্বোধ্যই থেকে যায় লোকচক্ষে। তবে দেওয়ালে লেখা 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্' ইত্যাদি বুদ্ধসংকল্পের ছাপ পড়েছিল ওই তপস্বীদের অন্তররাজ্যে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ইতিহাস পড়েননি কিন্তু সঙ্ঘের ধারণা স্বামীজীর মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, যার লক্ষ্য হবে জগতের কল্যাণ। স্বামীজী যেমন বৌদ্ধযুগের উত্থান-পতন অনুধাবন করেছিলেন, তেমনি পাশ্চাত্যে গিয়ে তাদের 'Organization'-এর অদ্ভুত কার্যকারিতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ধীরে ধীরে সঙ্ঘনির্মাণের একটা নতুন ভাবনা তাঁর মনে দানা বাঁধে। ধীরে কিন্তু নির্ভুল পদবিক্ষেপে নিজের অতি সংক্ষিপ্ত জীবনেই তিনি চেষ্টা করেছিলেন সেটির রূপ দিতে।

ভারতের জনগণকে জাগানো, তাদের মনুষ্যত্বে উন্নীত করার জন্য অন্নদান, শিক্ষাদানের ভাবনা চিঠিপত্রে স্বামীজী বারবার প্রকাশ করেছেন। সেইসঙ্গে তিনি নারীসঙ্ঘের কথাও ভেবেছিলেন। বৌদ্ধযুগের শোচনীয় পরিণতি দেখেও তিনি পিছিয়ে আসেননি। নারীর পবিত্রতার শক্তি ও কল্যাণী শক্তির ওপর ছিল তাঁর অসীম আস্থা। বৌদ্ধযুগে ভিক্ষুদের কাছে নতমস্তকে থাকা নারীরা স্বাধীনতার আস্বাদ পেলে সমাজজীবনে যে যুগান্তর নিয়ে আসবেন, এ-সত্য তাঁর উদার দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল।

সন্ন্যাসিসঙ্ঘ নিয়েও স্বামীজীর চিন্তাভাবনা গতানুগতিক ছিল না। সমাজ থেকে আসা সন্ন্যাসীদের পার্থিব দায়বদ্ধতা না থাকলেও আছে বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় কাজ করার দায়, যা ভগবান বুদ্ধের সময় থেকেই সাধুরা বহন করে আসছেন। ভারতের তীর্থে তীর্থে যেসব সাধু ভ্রমণ করেন, তাঁদের শক্তির অপচয়ে সমাজের মহাক্ষতি। সেই আধ্যাত্মিক শক্তিকে স্বামীজী সংহত করতে চাইলেন। তাঁর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ যে-ভাব গচ্ছিত করেছেন তার ধারক ও বাহক হবেন তাঁরই অনুগামী পার্ষদগণ। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের নতুন সঙ্ঘটিকে লালন-পালন করে তিনি এক নতুন যুগপ্রবর্তনে সঙ্ঘগঠনের উদ্যম করলেন। পাশ্চাত্যবিজয় যত না কঠিন ছিল, তার চেয়ে ঢের বেশি কঠিন ছিল প্রাচীন নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসজীবনের অনুবর্তী শক্তিধর তপস্বীদের কল্যাণকর্মে নিয়োগ করা। পদে পদেই দ্বন্দ্ব, সংশয়, অনাস্থা এসেছে এবং সেগুলি অতিক্রম করতে বিবেকানন্দকে অশ্রুবর্ষণ করে বলতে হয়েছে, ''ঠাকুরের কাজের জন্য আমি বুকের রক্ত বিন্দু বিন্দু পাত করে মৃতপ্রায় হয়েছি। তোমরা কি আমার এ কার্যে সাহায্য করবে না? কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে?''

আর্তির আকারে এসেছিল আদেশ। বিবেকানন্দের রক্তাক্ত হৃদয় শোণিতমোক্ষণ করেছিল দুই গোলার্ধের জন্য। বুঝেছিলেন, প্রথম ধাক্কাটা বিদেশ থেকে এলেও দীর্ঘস্থায়ী দামামার শব্দ তুলতে হবে ভারত থেকেই। এক অপূর্ব পরিকল্পনার জাল রচনা করেছিলেন তিনি দেশকে, জাতিকে তোলবার জন্য। তিরিশ বছরের যুবকের মাথায় সেদিন কী বিচিত্র চিন্তা খেলা করত তার পরিচয় রয়েছে বিদেশ থেকে লেখা পত্রগুলিতে। 'পত্রাবলী' হয়েছিল অগণিত ভাবের প্রেরণাবলি। সেখানে তিনি যুক্তি-শাস্ত্র-ইতিহাস, নিজের ক্ষুরধার বুদ্ধি, উদার হৃদয়ের পটভূমিতে শ্রীরামকৃষ্ণপ্রদত্ত মহাদায়কে ন্যস্ত করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টি ছিল ভাবী কালে প্রসারিত।

অনুভব করেছিলেন, সমস্ত জাতির একটা মানসিক বিরাট প্রস্তুতি অপেক্ষমাণ। তাঁর ডাকে আত্মত্যাগের আগুন জ্বলেছিল বাংলা ও ভারতের দিকে দিকে। তিনি জানতেন পরাধীনতার জাল ছিঁড়ে সিংহসাহসিকতায় ভারতাত্মা স্বাধীন হবে। মুক্ত আকাশে আঘ্রাণ নেবে। কিন্তু এর সঙ্গে ছিল আশঙ্কা। ত্যাগভূমি ভারতবর্ষ যুগ যুগ ধরে ত্যাগের মহিমায় অনড়, কিন্তু এবারে পাশ্চাত্যের দুরন্ত ভোগবাদ ভারতবর্ষকে গ্রাস না করে! স্বামীজী বুঝেছিলেন পৃথিবীর অন্যান্য দেশ একসময় অধ্যাত্মসম্পদ গ্রহণে অভিলাষী হবে। পিতৃপিতামহ-ক্রমে সঞ্চিত আধ্যাত্মিক সম্পদ ভারতকে বহন করতে হবে সমস্ত জগতের জন্য।

স্বামীজী ইতিহাসের পাতায় মিলিয়ে দেখেছিলেন—সভ্যতার উত্থান-পতন, ঐশ্বর্যের করুণ পরিণতি। দেখেছিলেন, শুধু বেঁচে আছে নিরীহ হিন্দুজাতি, তার আধ্যাত্মিকতা নিয়ে—পৃথিবীর এক কোণে।

পাশ্চাত্যের আগ্রাসী ধনগর্ব আমেরিকায় পদে পদে স্বামীজীর গতি ব্যাহত করেছিল। শক্তির আস্ফালন, যুক্তি-কুযুক্তির ঝড় বারবার বাধা সৃষ্টি করেছে। তাঁর নির্মল চরিত্রে কালিমালেপনের ক্রূর ষড়যন্ত্র যেন সিংহের হৃদয়ে আঘাত হেনেছে। আত্মপ্রত্যয়ের মহাগর্জনে স্তব্ধ হয়েছে হীন ষড়যন্ত্র। মুখ দিয়ে তাঁর উচ্চারিত হয়েছিল আমেরিকাবাসীদের প্রতি এক আশ্চর্য বাণী : ''আমি যা, তা আমার কপালে লেখা আছে। যদি আপনারা তা পড়তে পারেন, তাহলে আপনারা ভাগ্যবান। যদি না পারেন তাহলে আপনাদেরই ক্ষতি—আমার নয়।''

পাশ্চাত্য জাতিকে তিনি চিনতে পেরেছিলেন। পরম অদোষদর্শিতায় তাদের ভাবী সম্ভাবনার কথা জানাতে ভোলেননি। অধ্যাত্মপথের বুভুক্ষুদের হাতে তুলে দিয়েছেন ধর্মের অমৃত।

এই গোলার্ধে চেয়ে দেখেছেন বিপরীত চিত্র। অশিক্ষিত দরিদ্র মানুষ বাঁচার জন্যই সংগ্রাম করছে। উচ্চভাবের অধিকারী হতে তাদের এখনও অনেক প্রস্তুতি প্রয়োজন। বুঝেছিলেন তিনি, ত্যাগবৈরাগ্যের আগুনে প্রদীপ্ত কিছুসংখ্যক মানুষ দরকার যাদের হাতে ন্যস্ত করে যাবেন ভারতের আন্তর-সম্পদ। স্বামীজীর কম্বুকণ্ঠ বাজল আকাশ-বাতাস মথিত করে : ''মেয়ে-মদ্দ, যে আসে দে মাথা মুড়িয়ে, তারপর আমি আসছি।''

বুদ্ধদেবের মহাকরুণা প্লাবিত করেছিল আপামর জনগণকে। স্বামীজীর করুণাবর্ষণ নতুন পথে : ''পড়েছ, 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব'। আমি বলি, 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব'। দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরমধর্ম জানিবে।''

ভারত জুড়ে এদেরই জন্য তাঁর হৃদয়ে রক্ত ঝরেছে। অন্নহীনের মুখে অন্ন, গৃহহীনকে আশ্রয়, নিরক্ষরকে শিক্ষা, রোগীকে সেবাদান—এই নিয়েই তো যাত্রা শুরু হল। ধর্মের সঙ্গে কীভাবে এই জনসেবা জড়িয়ে গেল তা একটা মহা সমীক্ষার ব্যাপার। এর মধ্যেই স্বামীজীর সঙ্ঘ রূপ নিল। ত্যাগ-বৈরাগ্যের স্রোত বইল। মানবাত্মার জাগরণের সে এক অপূর্ব কাহিনি। বৌদ্ধযুগকে মথিত করে বহু মূল্যবান ভাব তিনি নিলেন এবং সেগুলির রূপদান করলেন অতি অল্প সময়ে।

বৌদ্ধযুগ ও রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্য আজ ইতিহাসের উপাদান হয়ে উঠেছে। রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের আরও প্রসার দেখার জন্য স্বামীজী প্রতীক্ষমাণ। তাঁরই অমেয় শক্তির খেলায় আমরা সঙ্গী আজ। এ-যুগ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যুগ। এর নবীন পদবিক্ষেপ, নব নব ভাবসঞ্চালন কোন কালকে আবাহন করে আনছে আমরা জানি না। কিন্তু আমরা ভাবী প্রজন্মের অপেক্ষায় আছি। তারা কবে স্বামীজীর উদ্যমকে সার্থক করে তুলবে—সেই প্রতীক্ষা।